মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে মন্বন্তর-মহামারি

তরুণকান্তি মন্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরসুনা কলেজ, ই-মেইল- tarunmandal12@gmail.com

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যে মন্বন্তর মহামারির প্রেক্ষাপটে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে। সেই সমস্ত সাহিত্য থেকে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত মন্বন্তর সম্পর্কিত কয়েকটি ছোটগল্পে মানুষের অসহায়তা, দুর্দশার করুণ ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মহামারির প্রতিচ্ছবি তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পতে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। মন্বন্তরজনিত তীব্র খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, নারীর লাঞ্ছনা, মনুষ্যত্বের পরিচয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ছোটগল্পকার সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মন্বন্তরপীড়িত মানুষদের বিপদ থেকে উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন ছোটগল্পগুলিতে।

সূচক শব্দ: মন্বন্তর, মহামারি, ক্ষুধা, পুঁজিবাদ, মৃত্যু

মূল আলোচনা: সাহিত্যে সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। সাহিত্য, দেশকাল বা কোনো অঞ্চলের সমসাময়িক বা সময়োত্তীর্ণ দর্শন। তাই সাহিত্যে ছাপ রয়ে যায় বয়ে যাওয়া সময়ের জন-জীবন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ-সংস্কার ও জীবন-মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি। মহামারি, মন্বন্তর প্রবলভাবে সময়কে নাড়া দিয়ে যায়, ভয়ার্ত নির্মম মৃত্যুর পাহাড় রচনা করে। যার বিধ্বংসী প্রভাব থেকে রেহাই পায় না অর্থনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, বিজ্ঞান, কোন কিছুই। বাংলা সাহিত্যের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে মন্বন্তর, মহামারির প্রভাব। বাংলা গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে মহামারি-মন্বন্তরের ভয়াবহ ছাপ। মহামারি, মন্বন্তরের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে মৃত্যুর অন্তহীন অন্ধকার। আর এই অন্ধকারের মধ্যেই বারংবার জ্বলে ওঠে মানবিকতার প্রদীপ। অন্ধকারের পটভূমিকায় সৃষ্ট গল্প, কাব্যকথায় ফুটে ওঠে অসহনীয় হৃদয়বিদারক স্পর্শ, থাকে সংকট মুক্তির আলোর দিশা। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা বা কখনও বিশ্বজুড়ে মানবসভ্যতা সংকটের মুখোমুখি হয়েছে এমন কিছু বিভীষিকা হলো প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, পোলিও, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ। মহামারির মতো বিভীষিকা আমাদের বাঙালি জীবনে যখনই এসেছে তখনই তার প্রতিরূপ ফুটে উঠেছে আমাদের সাহিত্যে। চর্যাপদ থেকে আবহমানকাল পর্যন্ত এই ধারা বহমান।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ শতকের চারের দশক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও ইংরেজদের উপনিবেশ হিসাবে ভারতের নাম জড়িয়ে যায় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে। বাংলার

আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহে পঞ্চাশের মন্বন্তর এক উল্লেখযোগ্য দুর্যোগপূর্ণ বিভীষিকাময় সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ তথা ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। এই দুর্ভিক্ষ দমনে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা বাংলাকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকার প্রাথমিক ভাবে এই মন্বন্তরকে স্বীকার করতেই সম্মত হয়নি। অনাবৃষ্টিই পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক কারণ রূপে বিবেচিত। অনাবৃষ্টির সাথে যুক্ত হয় ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি। স্বাভাবিকভাবেই মোট জনসংখ্যার নিরিখে উৎপাদিত শস্যের ঘাটতি দেখা যায়। প্রশাসনিক ব্যর্থতা আর স্বার্থান্বেষী মজুদদারদের কালোবাজারি চক্রের ফলে এই সংকট ক্রমে আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে সমকালে এবং পরবর্তীকালে বহু সাহিত্য রচিত হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ছোটগল্প। ছোটগল্পের পরিসর সংক্ষিপ্ত হওয়ায় লেখকরা মন্বন্তরের এক একটি অংশ তুলে ধরেছেন। মন্বন্তর কেন্দ্রিক অধিকাংশ ছোটগল্পে প্রাধান্য পেয়েছে মন্বন্তরের ভয়াবহতা। পঞ্চাশের মন্বন্তরকে অবলম্বন করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হলেও ছোটোগল্পের প্রতি স্বভাবগত আনুগত্যই এই পর্বে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। মন্বন্তর আশ্রয়ি ছোটগল্প রচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম সফল লেখক। দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে রচিত গল্পগুলি 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৩) এবং 'পরিস্থিতি' নামক গল্পসংকলনে সন্নিবেশিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশু' গল্পটি গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত, সংকলনের অনুরূপে নামাঙ্কিত গল্পটি দুর্ভিক্ষ পরবর্তী বিপর্যস্ত বাংলার গ্রাম্যজীবনের পটভূমিতে সমাজিক অনুশাসনের পুনর্বিশ্লেষণ। স্বামীহারা অসহায় মুক্তা চরম অনাহারের দিনে দাশমহাশয়ের অশ্লীল প্রলোভনে সাড়া না দিয়েও শেষপর্যন্ত তার সতীত্ব রক্ষায় অসফল হয়েছে। পেটের জ্বালায় আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত গ্রাম বাংলার নিঃস্ব, রিক্ত, মৃতকল্প চেহারার বাস্তব রূপায়ণ দেখা যায় 'দুঃশাসনীয়' গল্পে। বিদেশি সরকারের শোষণে নয়, স্বদেশি সরকারের শাসনে বাংলার দরিদ্র মানুষকে যে অবর্ণনীয় বস্ত্রসংকটের মধ্যে দিনযাপন করতে হয়েছে, তার করুণ বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে এই গল্পে। গল্পে দেখা যায়, কাপড়ের অভাবে দিনের আলোয় মা বোনেরা বাইরে বেরোতে পারছে না। কাপড়ের অভাব এতটাই যে দিনের বেলায় অন্ধকার ঘরে একসাথে মা, মাসি, পিসে, বউ লজ্জা নিবারণের চেষ্টায় একত্রে থাকে। সমাজে বিপিনের মতো অসাধু স্বার্থান্বেষী পুঁজিবাদী মানুষের ভয়ার্ত করালগ্রাস থেকে মালতী, বিন্দীর মতো মেয়েরা রক্ষা পায় না। আলোচ্য গল্পে কাপড়ের অভাব অসহায় ভাবে চরিত্রেরা মেনে না নিয়ে প্রতিবাদ করতে থাকে, খুঁজতে থাকে উত্তরণের পথ। মানুষের দুঃখ দুর্দশার, সংহত প্রতিবাদের পাশাপাশি সমাজের একশ্রেণীর মানুষ কীভাবে খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব সৃষ্টি করেছে তা সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। গল্পে রাবেয়ার প্রশ্ন—

> "কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ি বদলে নিয়ে পরে কী করে? আজিজ সাহেবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ির তলায় মোটা আবরণ পায় কোথায়?"[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাড়ে সাতসের চাল' গল্পে মহামারির করুণ ও বীভৎস রূপের ছবি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে-সন্ন্যাসীর জবানিতে নিজের পরিবার সহ সমগ্র সমাজজীবনের করুণ পরণতির কথা জানতে পারি। সন্ন্যাসী সাড়ে সাতসের চাল নিয়ে নিজের অভুক্ত পরিবারকে বাঁচাতে চেয়েছে। তাই স্টেশন থেকে দীর্ঘ সাতমাইল পথ রাতের বেলায় দুর্বল শরীর নিয়েও বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

> "স্টেশন থেকে তিন মাইল দূর সালাতি পেরিয়ে আরও চার মাইল হেঁটে পলাশমতিতে পৌঁছাবার কষ্ট সন্ন্যাসীর কল্পনায় ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। ... জিরিয়ে জিরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে হয়তো এত দেরি হবে যে সঙ্গে তার সাড়ে সাত সের চাল থাকা সত্ত্বেও বাড়ির লোকের মধ্যাহ্নভোজনটা ফসকে যাবে।"[২]

সন্ন্যাসী কষ্ট সহ্য করেও বাড়ির উদ্দ্যেশ্যে দ্রুত রওনা দিয়েছে, কারণ যদি বাড়ি ফিরতে দেরি হয় তবে পরিবারের কেউ না খেতে পেয়ে মারা যেতে পারে। সন্ন্যাসীর ভাবনায় ক্ষুধার করুণ অসহায় আর্তনাদের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

> "না খেতে পেয়ে কজন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মরে গেছে কে জানে! কজন মরোমরো হয়ে আছে তাই বা কে জানে! দু-একজন হয়তো ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছেছে— এদের মধ্যে সোনা বউঠান একজন হতে পারে— তার সাড়ে সাত সের চালের দুমুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝরাত্রেও দিতে পারলে সারা জীবন মরণের সীমারেখায় টলমল করার বদলে বেঁচে যাওয়ার দিকেই কোনমতে ঢলে পড়তে পারবে?"[৩]

গ্রামের পর গ্রাম মহামারির কবলে পরে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে, আর যারা জীবিত ছিল, তারা বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টায় নিজের অভুক্ত শীর্ণই রোগা শরীরকে টেনে টেনে শহর নগরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। সন্ন্যাসী গ্রামের নিস্তব্ধ পরিবেশেষ ভবিষ্যৎ পরিণামের আশঙ্কায় সন্ন্যাসীরও মাথা ঘুরে পড়ে যায়। বাড়ি পৌঁছে কারোর দেখা না পেয়ে পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে দাওয়া থেকে হুমড়ি খেয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মারা যায়। সন্ন্যাসীর মাধ্যমে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহামারি কবলিত পুরো সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন।

'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রশ্নকে সামনে রেখে মহামারির নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পকার যোগী ডাকাতের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের হাহাকার সামান্য ফ্যানের জন্য, কুকুরের সাথে লড়াই করে ময়লার স্তুপ থেকে খাদ্য সংগ্রহে বুভুক্ষুদের চেষ্টা, অসহায়তা বর্ণিত হয়েছে। বাজারঘাট, অলিতে গলিতে স্বচছল ব্যক্তিদের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট নিয়ে ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে মারামারি করতে হয়। অন্যদিকে দেহলোলুপ নরপিশাচদের লেলিহান থাবা থেকে বাঁচতে পারেনি অসহায় দুর্বল মানুষগুলি। রিলিফ ক্যাম্পগুলির দুর্নীতি গল্পকার তুলে ধরেছেন—

> "মোদের খিচুড়ি ভোগের যে চাল ডাল আসে তাও বেশিরভাগ চোরাগোপ্তা হয়ে যায়, নইলে খিচুড়ি এমন নুন জলের মতো লাগে।"[৪]

গল্পকার এই গল্পে যোগী ডাকাতের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের হাহাকার, দুর্দশা, অসহায়তা ও মৃত্যু মিছিলের চিত্র তুলে ধরেছেন, তেমনি নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যোগীর কথায় এই সুযোগসন্ধানী স্বার্থলোলুপ শাসকদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে শোনা যায়—

> "সাধ যায় না, চাঁছা গালে একটা থাপ্পড় দিয়ে কানটা মলে দিয়ে? বে-আইনি কাজ, বে-আইনি! যে জানে মরে যাবে কেড়ে না খেলে, সে হিসেব করছে কাজটি আইনি না বেআইনি।"[৫]

'কে বাঁচায় কে বাঁচে' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন মহামারির করুণ পরণতি, দুর্ভিক্ষপীড়িত পীড়িত মানুষের করুণ আর্তনাদ, পুঁজিবাদী শ্রেণির স্বার্থপরতার ছবিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মৃত্যুঞ্জয় ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যু দেখে আর্তনাদ করে ওঠে। ফুটপাথের মৃত্যু যে সহজ সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার তা তার বন্ধু নিখিলের কথায় বোঝা যায়।

> "ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যুর মতো সাধারণ সহজবোধ্য ব্যাপারটা সে ধারণা করতে পারছে না।"[৬]

মৃত্যুঞ্জয় অনাহারে মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেনি। নিজের মাসমাইনের টাকা বিলিয়ে দিয়েছে, নিজের চাকরি, পরিবার ত্যাগ করে মিশে গিয়েছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অসহায় মানুষদের সঙ্গে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা' গল্পে মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান বর্ণানেতই থেমে থাকেননি। সেই সঙ্গে কেশবের পিতৃমনস্তত্ত্ব ও ধর্মভীরু কালাচাঁদের হঠাৎ জেগে ওঠা ঠুনকো মনুষ্যত্বকেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বলিষ্ঠতার সঙ্গে। কেশব তার মেয়েকে বিক্রি করার সময় বিবেক যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য নির্বাচিত ছোটগল্পগুলিতে দুর্ভিক্ষকালীন মানুষরে মানবিক অবক্ষয়, চরিত্রের অধঃপতন, নারীর সতীত্ব বিসর্জনের পাশাপাশি অগ্নস্ফুরণের মতো কখনো কখনো মানবিক গুণাবলীর স্ফুরণ ঘটেছে তার ছোটগল্পে। বিনা রায়চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

> "দুঃখী অসহায় মানুষগুলির প্রতি মমতা তাঁকে প্রতিবাদী করে তোলে অথচ তিনি যে শিল্পী সে কথা বিস্মৃত হন না। তাই তাঁর বেশির ভাগ গল্পেই শিল্পের দাবিটুকু রক্ষিত হয়েছে।"[৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, মন্বন্তর পীড়িত মানুষদের বিপদ থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় একজোট হয়ে প্রতিবাদের মাধ্যমে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। তিনি গল্পে দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া সমাজের ভাবনা, অহংকার, স্বার্থপরতা ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে, মানব সভ্যতার যথার্থ পরিবর্তন সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী যুগান্তর (সম্পাদক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, মার্চ ২০০৮, পৃ. ৯৪

২. তদেব, পৃ. ৮৮

৩. তদেব, পৃ. ৮৮

৪. তদেব, পৃ. ১৩৩

৫. তদেব, পৃ. ১৩০

৬. তদেব, পৃ. ৮৫

৭. রায়চৌধুরী বিনতা, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৬